উচ্ছিন্ন পরবাস

মহীতোষ বিশ্বাস

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

।। এক ।।

—'ও দিদি—ভালো?—ও মাসি—ভালো?'—.

মুখে মুখে চকিত উচ্চারণ। কানে কানে, যেন হাওয়ায় ভর ক'রে, সে উচ্চারণ বিস্তৃতি পায়। উপচানো ভিড়। গাদাগাদি। ঠাসাঠাসি। তবু সেই বদ্ধ ঠাস বুনোটের রশি আলগা ক'রে, এ-জানালার সন্ধানী ফোকর গলিয়ে, ও-দরজার আড়ালটুকু সম্বল ক'রে, চকিত উচ্চারণ যেন এক আর্ত জিজ্ঞাসায় রণিত হয়—'ও দিদি—ভালো? —ও মাসি—ভালো?'

সেই রণন ফিরতি দলের কাছ থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে ফেরে—'ভালো—ভালো।' এবং এই উচ্চারণ নিশ্চিতভাবেই এ-দলের কাছে সঞ্জীবনী টনিকের মতো প্রাণদায়ী হয়ে ওঠে।

দিনভর নিরন্তর এই এক খেলা। এবং এই খেলা, নিহিতার্থে বুঝি জীবন-সংগ্রাম। এ-সংগ্রামের ক্ষেত্র শুধু দিন নয়, রাত্রের অর্ধাংশেও বিস্তৃতি পায়।

দূর মফস্বল উজিয়ে ট্রেন আসে। নিয়তই সে ট্রেন যাত্রীবহন-ক্ষমতার ঊর্ধ্ব সীমারেখা অতিক্রান্ত। কেরাণীবাবু, শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, ফড়ে, ভবঘুরে, ভিখারী—হরেক ধান্দার কর্মকান্ডের এক বিশাল প্রবাহ। কামরায় কামরায় অকুলান ভিড়। ওরাও তার অঙ্গীভূত। পোঁটলা-পুঁটলি, বোঁচকা-বুঁচকি। সম্ভাব্য সব স্থান, সব সুযোগের যথাসাধ্য সদ্ব্যবহারের আপ্রাণ প্রচেষ্টা। মধ্যবয়সী বউ-ঝিদের এক কাঁখে প্রাকৃতিক সংলগ্নতার মতো এক একটি বাচ্চা, অন্য কাঁখে সমধিক যত্নে সংরক্ষিত চালের পুঁটলির সংগোপন আশ্রয়। খালি হাত পায়ের মেয়ে বউদের হাত এবং কাঁখটি বহন-ক্ষমতার চূড়ান্তে প্রসারিত, পুরুষ্টু বস্তাগুলো অবলীলায় অথবা কষ্টে বহনে ব্যাপৃত। মফস্বলের বাজারে তুলনামূলক সস্তা চাল। দশ বিশ কেজি কলকাতার বাজারে পাচার নিশ্চিতই কিছু অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করে।

গভর্ণমেন্টের নানাবিধ পরিকল্পনার মধ্যে এই কলটিও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে একটি মজাদার বস্তু হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। কলকাতার খোলা বাজারে চালের ক্রয়-বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা। অতএব রেশন-সপ ভরসা এবং সরবরাহ বিশেষ নিয়মে অনিয়মিত। ফলে সপ্তাহের তিন চার দিনের পক্ষেও তা পর্যাপ্ত নয়।

মাঝে মাঝেই সেই স্বল্পতম সরবরাহেও এমন সব বস্তুর আবির্ভাব ঘটে, যার দর্শনে রেশন-কার্ডধারীরা বিস্তর গবেষণা চালিয়েও স্থির করতে পারেনা, এমন নিম্ন-মানের খাদ্য-শস্য ভারতবর্ষের কোন্ অঞ্চলে উৎপন্ন হয়।

ফলে বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে এই যে চাল পাচারকারী দলবল, এরা কলকাতার বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার সামগ্রিক জনজীবনের রসদ জোগানোর ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান এবং অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ করে। চালের পুঁটলি নিয়ে হাজির হ'লে, সময়ের বাছ-বিচার অবান্তর, হোটেলের মালিক বাবুদের কাছে আলাদা খাতির। যেন, ঘরে কুটুম এলো। শিয়ালদার সন্নিহিত অঞ্চলে আছে চালের আড়তের মহাজন, বিক্রি-বাটার প্রকাশ্য-গোপন ব্যবসাকেন্দ্র। খেপের হিসেব সারাদিনে দশ বারোতেও বর্তায়। ফলে কাঁচা পয়সায় ট্যাঁক ফলবান হয়।

জীবিকার্জনের তাগিদে, আর সব সহজ অর্থকরী ক্ষেত্রের মতো, এ লাইনেও তাই আমদানি হয় নতুন নতুন মুখ, এবং সেখানে বয়সের সীমারেখাটা নির্দিষ্ট কোনো গন্ডীতে আবদ্ধ থাকে না। দশ বারো বছরের এক একটা পুঁচকের পাশে ষাট-পঁয়ষট্টির বুড়ো-বুড়ীরও অনায়াস সহাবস্থান। তেমন তেমন ছোঁড়াছুড়ী, যাদের ফুসফুসে বেশী মাত্রায় দম আর দুঃসাহস, এক একবারে পঞ্চাশ ষাট কে.জি.তেও পাচার-কর্মটি বর্ধিত করে। ফলে ১৯৬৫ সালের রেশনিং আইন গুরুত্ব হারায়।

তবে এই লাভজনক পাচার-কর্মটি সর্বদাই নির্বিঘ্ন, এই গ্যারান্টি নিশ্চিতই ভঙ্গুর। কর্মটি যেমন লাভজনক, তেমনই ঝুঁকিবহুল, এবং লাভের গুড় পিঁপড়েতে উদরসাৎ করার ঘটনাও তাই প্রায়শঃই পুনরাবৃত্ত হয়।

স্টেশনে পুলিশ থাকে কখনো কখনো। পুলিশের এই 'স্টাফ্' ওদের উচ্চারণের পারিভাষিকে 'এস্টাফ' বলে রূপান্তরিত হয়। সাধারণ 'স্টাফ্কে' ওদের ভয় কম। দু'চার দিন বাদেই আড়টা ভেঙে যায়, একটু চিন্-পরিচয় গড়ে ওঠে, এবং তেমন তেমন ক্ষেত্রে একটু চালাচালির ব্যবস্থায় রফা হলে গোটা ব্যাপারটার মধ্যে একটা স্বাভাবিকতা আসে, যাতে উভয়তঃই কাজটা সহজসাধ্য রূপ পায়। অবস্থা জটিলতর হয়, যেদিন 'এস্পেশাল' (স্পেশাল) বসে।

এন্ফোর্সমেন্ট বিভাগ থেকে মাঝে মাঝে রেল পুলিশের সহযোগিতায় ট্রেনে অভিযান চালানো হয়। গোটা পরিস্থিতিটাই সেদিন ভোল্ পালটে টানটান হয়ে ওঠে। আগাম সতর্কতার লক্ষণ ছড়ায় চারিদিকে। ক্রসিং স্টেশনে দুই ট্রেন এসে দাঁড়ায় পাশাপাশি। আপ ট্রেনে সব খালি হাত। কলকাতার বাজারে সদ্য সওদা নামিয়ে, নগদ পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে, পারিপার্শ্বিক হাল-চালের আবশ্যকীয় সংবাদাদি সংগ্রহ ক'রে, তখন ফিরতি পথে যাত্রা। মনে ভাবনা-উদ্বেগের কালি নেই। শারদ আকাশের মতো ভারমুক্ত। ফলে সেই শূন্যতার পরিসরটুকু রসের গল্পের টগ্‌বগানিতে উচ্ছল হয়।

আর ডাউন ট্রেনে তখন ভিন্ন চিত্র। অনিশ্চিত সংশয়ের ধুক্‌পুকানি। ট্যাঁকের কড়ির বহুলাংশের বিনিময়ে পোঁটলা-পুঁটলি ব্যাগ ইত্যাদি পূর্ণতা পেয়েছে।

যারা কিছু ভীতু এবং সাবধানী, তারা কৌশলের আশ্রয় নেয়। সর্পাকৃতি লম্বা চালভর্তি থলি নারীদেহের কোমর, বুক, পিঠ প্রভৃতি সংগুপ্ত স্থানে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ। কোনো নারীর উদরে অকল্পনীয় বিস্ফার। যেন দশ মাস দশ দিনের আসন্ন-প্রসবা ভরা পোয়াতি, খালাস হবার অনিবার্য তাগিদে নিরাপদ শেল্টার নিতে চাইছে।

এইসব জটিল পরিস্থিতিতে প্রতিটি মনের কেন্দ্রবিন্দুতে তাই কালবৈশাখীর বিদ্যুৎ-চমকের মতো ধুক্‌পুক্ ধুক্‌পুক্। যদি কোনো স্টেশনে 'এস্পেশাল' থাকে! টেনে টেনে নামাবে সব। পালাতে গেলেই চারদিকে সাঁড়াশি। পঁচিশ ত্রিশ কে.জি.র বস্তাগুলো নিমেষেই হাওয়া হয়ে গায়েব হয়ে যাবে।

অক্ষমের শেষ অবলম্বন কান্নাকাটির আশ্রয় ওরা অবশ্যই গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু তা কোনোই ফলদায়ী হবেনা, বরং উল্টে রুলের বাড়ি পড়বে হাতে পায়ে। আগে 'পাবলিকের' কিছু কিছু প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যেতো—

—'ছেড়ে দিন্ দাদা, গরীব মানুষ দু-পাঁচ কে.জি চাল নিয়ে যাচ্ছে, ওদের ধ'রে কি হবে? রাঘব বোয়ালদের ধরুন না!'

এসব কথা আগে অংশত ফলদায়ক হ'তো। আজকাল পাব্লিকের চরিত্রও বোঁদামারা। কেউ

কিছু বলে না। পুলিশও আর 'পাব্‌লিক'কে জুজু ভাবে না, ফলে পাত্তাও দেয় না। তাই নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে ওদের আর কেউ অংশীদার নেই। সম্পূর্ণতঃ ওটা এখন ওদের নিজেদেরই দায়িত্বে রক্ষিত।

ভিড়ের গাড়ীতে মাঝে মাঝে দু'একজন প্যাসেঞ্জারবাবুর ক্ষ্যাপামি ধরে—'ব্যাটাদের লোভের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে, এক একজন ডেলি কত ক'রে কামায় জানেন?'

—'দেবো একদিন সব কটাকে পুলিশে ধরিয়ে।'—এমনিই সব নানা মন্তব্য।

এসব দুর্নীতি-দলনী বাক্য অবশ্য দীর্ঘতা পায়না। একটু পরেই রেলযাত্রী বাবুরা নিজস্ব সাংস্কৃতিক জগতে লিপ্ত হ'ন। কেউ তাস হাতে ধ্যানী বকের দশা প্রাপ্ত হ'ন। কেউ মনোযোগী হ'ন অফিসের কেচ্ছাদি বিষয়ে। আবার কেউ শরীরের কোনো একটা অংশকে কোথাও একটু সাপোর্ট দিয়েই দিব্যি ঝিমুনি লাগান। ভিড়, ধাক্কাধাক্কি, হুড়োহুড়ি,—'ও মশায়, এটা কি হচ্ছে, ওটা কি হচ্ছে'—ইত্যাদি হ্যানা-ত্যানায় পারস্পরিক কোন্দলের ব্যাক-গ্রাউণ্ড মিউজিকটিও বাজতে থাকে অহরহ। ফলে গাড়ীর বাবুদের তাৎক্ষণিক উত্তেজনা, যা তাদের প্রতি দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে দপ্ ক'রে নিভে যায়, তার প্রতি ওরা বিশেষ পাত্তা-পরোয়া দেখায় না। তাছাড়া, ওরাও এখন নিত্য যাতায়াতের সুবাদে রেলপথের ডেলি-প্যাসিঞ্জারির কৌলিন্যের অধিকারী। ওরাও এখন মাননীয় ডেলি প্যাসেঞ্জার। ওদের নির্বাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভয়ের কেন্দ্রবিন্দু তাই শুধু ঐ মাঝে-মধ্যের 'এস্‌পেশাল'।

যেহেতু ভয়ের ঐ ব্যাধি বড়ো স্পর্শকাতর এবং সংক্রামক, তাই কোনো স্টেশনে দুই গাড়ীতে ক্রসিং হলেই ডাউন ট্রেনের দরজায় জানালায় ভীত ত্রস্ত জিজ্ঞাসা অবিরাম হামলায়—'ও দিদি—ভালো?'—ও মাসি—ভালো?'

এদিকের সব স্টেশন বিপদ-মুক্ত থাকলে আপ-এর গাড়ী জানান দেয়—'ভালো—ভালো—।' —আর 'এস্‌পেশালের' হামলা থাকলে সেই মারাত্মক দুঃসংবাদটি অনিবার্য সতর্কতার তাগিদে নানাকণ্ঠে উচ্চারিত হয়।

এতে ফলতঃ সকলেরই নিজস্ব সাবধানতা অবলম্বনের সুযোগ ঘটে। মাঝপথেই কেউ বাধ্যতামূলক যাত্রাভঙ্গ করে। আবার যারা উপায়ান্তর-হীন, মাঝপথে অবতরণে অক্ষম, নিজস্ব চাল-পূর্ণ মূল্যবান বস্তাগুলোকে কামরার মধ্যে দরজার আড়ালে, বেঞ্চির তলায়, প্যাসেঞ্জারদের পায়ের ফাঁকে, অবিরাম লুকায়। অথবা অধিকতর কোনো নিরাপত্রার সন্ধানে তৎপর হয় অতীব ক্ষিপ্রতায়।

একটা বস্তাকে এ-পাশে বেঞ্চের তলায় ঢুকিয়ে এবং দ্বিতীয়টিকে কাঠের পার্টিশনের গায়ে ঠেস্ দিয়ে রেখে পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বিন্তি। বিনতা ঘোষাল—অধুনা চাল পার্টির পয়লা-নম্বরের মেয়ে—এ লাইনের একটি কিংবদন্তীমূলক নাম। অফিস টাইমের থক্‌থকে, গায়ে গা লেপটানো ভিড় এখন। ওরই মধ্যে বস্তাগুলোকে সামলে-সুমলে, অগ্রবর্তী প্রতিটি স্টেশনের প্রতি সতর্ক নজর রেখে, ত্রস্ত অপেক্ষার রোজনামচা। বিন্তিও এখন এসব আনুষঙ্গিক সাবধানতায় ব্যাপৃত।

আজকের এই বিন্তিকে দেখে বছর কয়েক আগেকার বিন্তির শারীরিক অথবা মানসিক রূপ-চিত্রটি আনুমান করা দুরূহ। বিনতা থেকে 'বিন্তি'তে তার এই অমোঘ পরিবর্তন—সম্ভবত বিন্তির নিজস্ব অনুমানের সীমার মধ্যেও আসে না। সমগ্র ব্যাপারটির মধ্যে এমনই একটি বৈপরীত্য, যার নিগূঢ় চিন্তায় বিন্তিও হয়ত বিমূঢ়তা বোধ করবে। চালের চোরাচালানের দলের সঙ্গে মিলেমিশে নিঃশেষে একাকার হয়ে যাওয়া—বিন্তির কয়েক বছর আগেকার মানসিকতা বা পারিবারিক পারিপার্শ্বিকতার আবহাওয়ায় ছিল অকল্পনীয়। সেটাই ঘটেছে, যেহেতু বাস্তবও কখনো কখনো কল্পনাকে অতিক্রম করে।

দেশ-বিভাগের ঝাপটায় প্রায় একবস্ত্রে দেশ ছেড়েছিলেন উমাপতি ঘোষাল। দেশের মাটির ভালবাসার শিকড়-বাকড়ের বড়ো টান। সেই মায়াবী টানে দেশ-বিভাগের পরও আটকে ছিলেন বেশ কয়েক বছর উমাপতি। পৈতৃক ভিটে, জমিজমা, শিষ্যবাড়ীর প্রণামী—এই অভ্যস্ত জীবন-যাত্রা থেকে রিক্ত হয়ে অনিশ্চিত জীবনের হঠকারিতায় পা বাড়াতে স্বাভাবিক দ্বিধা ছিল তার মনে। কয়েক পুরুষের উত্তরাধিকার নিয়ে তিনি ছিলেন যে-অঞ্চলের বাসিন্দা, সেখানকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও মোটামুটি একটা চলনসই অবস্থায় স্থিত ছিল। কিন্তু সেখানেও বহিরাগত পশু-শক্তির অনুপ্রবেশে বিলম্ব ঘটল না। এবং অচিরেই কিছু সুযোগ-সন্ধানীর মদত-পুষ্ট হয়ে আগুন জ্বলল। ঐ অঞ্চলের হিন্দুদের তা দাহ্য-পদার্থে পরিণত করতে বেগবান হ'ল। একটুর জন্যই পৈতৃক প্রাণটিকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন উমাপতি এবং নিতান্ত নিঃসহায়ে, এক বস্ত্রে, স্ত্রী এবং বালক পুত্রকে নিয়ে চলে এসেছিলেন, অথবা আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, এ-পার বাংলার বিভূঁয়ে।

তারপর অনিবার্যভাবেই শুরু হয়েছিল এক অপ্রস্তুত কঠিন লড়াই। দু'মুঠো অন্ন, মাথা-গোঁজার একটু ঠাঁই, যৎ-কিঞ্চিৎ পরিধেয়। কিছুই অনায়াস-লভ্য নয়, বরং এর প্রত্যেকটির জন্যই উমাপতির দেহের রক্তবিন্দু জলকণায় পরিণত হচ্ছিল। কিন্তু এই অসম লড়াইয়েও উমাপতি নিজেকে পরাজিত হতে দেননি। অন্ততঃ সংগ্রামের বিরামহীন প্রচেষ্টাটা অব্যাহত রেখেছিলেন। সাত জায়গায় নানাবিধ নাকানি-চোবানি, প্রতিশ্রুতি, প্রতারণা ইত্যাদিতে বিষম রকম জেরবার হতে হতে শেষ পর্যন্ত উমাপতি একটু আশ্রয়ের হিল্লে করতে পেরেছিলেন।

রেল-স্টেশন থেকে প্রায় মাইল দুয়েক দূরে, হোঁগলা-বাঁশ-জলা জঙ্গল ঠেঙ্গিয়ে সদ্য-নির্মীয়মান একটি রিফিউজী কলোনী। ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার আত্যন্তিক প্রয়াসে উমাপতি বিলক্ষণ কামড়া-কামড়ি ক'রে সেখানে এক চিলতে জমি দখলের সম্ভাবনাকে কার্যকরী করতে পেরেছিলেন। ছোটো একটা ঘরও তুলেছিলেন মাথা গোঁজার। রিফিউজী কলোনীর শিক্ষা-বিস্তারের নড়বড়ে একক ভরসাস্থল প্রাইমারী স্কুলটিতে শিক্ষকতার একটু ব্যবস্থাও হয়েছিল। অভাব-দারিদ্র এবং আনুষঙ্গিক হীনমন্যতা—এগুলির সাহচর্য এড়ানো সম্ভব ছিল না, তবু উমাপতি বিগত কয়েক বছরের দুঃস্বপ্নের ক্লেদ গ্লানিকে ভুলতে চেয়েছিলেন এবং যে কোনো আশাজীবী মানুষের মতোই ক্লিন্ন বর্তমান এবং অনাগত ভবিষ্যতকে ঘিরে একটি সুখ-স্বপ্নের মায়া-নীড় রচনায় বড়ই নিষ্ঠাভরে নিয়োজিত করেছিলেন নিজেকে।

তাঁকে এ বিষয়ে বীজাকারে হলেও মদত জোগাচ্ছিল পারিপার্শ্বিক কিছু উপকরণ। নিতান্ত অনাদৃত পরিবেশে তাঁর বালক-পুত্রটি বড়ো হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। অপুষ্টি-জনিত ক্ষীণ কলেবরেও সহজাত মেধার বিকাশ ঘটেছিল। মেধা এবং রিফিউজী সার্টিফিকেটের কল্যাণে আর্থিক অনটন ছেলেটির উচ্চ শিক্ষার পথে মারাত্মক কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারল না। স্কুল ছাড়িয়ে কলেজ। মেধা, মনোযোগ এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার বাঙাল গোঁয়ারপনায় কলেজী শিক্ষার ক্ষেত্রেও সে নিজেকে যথেষ্ট সম্মানের আসনে বসাতে পারল।

ইতিমধ্যে সংসারে এসেছে আর একটি নতুন মুখ। স্নেহ এবং মমতায় আপ্লুত উমাপতি মেয়ের নাম রেখেছিলেন—বিনতা। ছেলে এবং মেয়েকে তুল্যমূল্যে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ববোধে উমাপতি মেয়েকেও স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। ছাত্রী হিসেবে বিনতার মধ্যেও কৃতিত্বের স্ফুরণ ঘটল। মেধাবী দুটি সন্তানের জনক হিসেবে নম্র অহংকারী আত্মসুখ অনুভব করতে থাকেন উমাপতি। ছেলেমেয়েকে কেন্দ্র ক'রে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং হৃত-মর্যাদা পুনরুদ্ধারের অলৌকিক স্বপ্ন তাঁকে বর্তমানের হতমান দিনযাপনের দুঃসহতাকে তাৎক্ষণিক এবং ক্ষণস্থায়ী ব'লে ভাবতে শেখায়।

ছেলে বি.এস.সি পাশ ক'রে সম্মানজনক শর্তে চাকুরিতে বহাল হয় একটি নামী প্রতিষ্ঠানে। সফলতার এই সূত্রপাতে ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনাময় দিকটি যখন ক্রমশঃ একটি বাস্তব-ভিত্তিক অবয়ব গ্রহণের উপযোগী হয়ে উঠছিল, তখনই বোঝা গেল, ভাগ্য কী নির্মম প্রতারক। নাটক-নভেলীয় ঘটনা ব'লে যে-সব মোটা দাগের ব্যাপারগুলোকে চিহ্নিত করা হয়, বাস্তবেও তার এক-আধটা দুর্লক্ষ্য নয়। অফিস-ফেরত ছেলে একদিন আর বাড়ী ফিরল না। পরদিন পুলিশ মারফত খবর পেয়ে উদ্‌ভ্রান্ত, দিশেহারা, বজ্রাহত এক বৃক্ষের ন্যায় বিপর্যস্ত উমাপতি যখন পৌঁছলেন হাসপাতালে, তখন সব শেষ। ভিড়ের বাস থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে মাথাটা থেঁতলে যায় এমন মারাত্মক ভাবে, চিকিৎসা-শাস্ত্রের আপ্রাণ চেষ্টাতেও যেখানে আর করণীয় কিছু ছিল না।

এই নির্মম শোকের আঘাত উমাপতিকে হত বুদ্ধি জড় এবং স্থবির ক'রে দিয়েছিল। দুর্ভাগ্য যখন আসে, তখন একা আসে না, এই বহুল প্রচারিত প্রবাদ-বাক্যটিও এ-সময় উমাপতির ক্ষেত্রে বলবান হ'ল। ছেলেকে হারানোর বছর খানেকের মধ্যেই হারালেন স্ত্রীকে। সংসারকে তখন একটি অথৈ জলাশয় ব'লে মনে হ'ল, এবং এ-জাতীয় পরিস্থিতিতে সাঁতারে অদক্ষ উমাপতি মেয়েটিকে নিয়ে চূড়ান্ত কাহিল হয়ে পড়লেন। শরীর এবং মন দুই-ই নিস্তেজ, গতিহীন। কিন্তু গত কয়েক বছর ধ'রেই উমাপতি নানাবিধ প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে এক ধরনের সহিষ্ণুতা এবং স্থিতিশীলতার শক্তি অর্জন করেছিলেন, যা তাঁকে এই নতুন পরিস্থিতিতেও একেবারে দুমড়ে মুচড়ে নিঃশেষিত হতে দিল না। সংসার নামক ঘানিটি তাঁকে টেনে চলতেই হবে, কারণ এ-ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখার চিন্তাটাই তখন তাঁর কাছে সব থেকে বলবতী মনে হ'ল। বছর দুয়েকের মধ্যে উমাপতিকে চাকরি থেকে অবসর নিতে হ'ল এবং তাঁর প্রাইভেট টিউশানির যৎসামান্য উপার্জনই জীবিকা-নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়াল।

ওদিকে কাল-গতির অনিবার্য পরিণামে কৈশোর অতিক্রান্ত হ'ল বিনতা। তার শরীরে যৌবন এলো এবং সেটা এলো বেশ প্রবল মাত্রায়। বর্ষার কলাগাছের মতো তার শরীরের এই বাড় ভিন্নতর এক ধরনের বিপত্তি সৃষ্টি করল তাদের নিস্তরঙ্গ পারিবারিকতায়। স্কুলটি বেশ দূরে। স্কুলে যাতায়াতের পথে নানা ধরনের কুৎসিৎ দৃষ্টির সম্মুখীন হতে হয় তাকে প্রায়ই।

তবু এক রকম চলছিল। কিন্তু পরিস্থিতি জটিল ক'রে তুলল একটি ছেলে। নিবারণ দাসের ছেলে পলাশ।

স্টেশন সংলগ্ন বাজারে মুদিখানার দোকান নিবারণের। সামান্য আনাজ-পাতির দোকান দিয়ে শুরু করেছিল নিবারণ। সহজাত একটি কৌশলী ব্যবসা-বুদ্ধি ছিল নিবারণের মধ্যে এবং পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র অনুকূলতায় তার সেই ব্যবসা-বুদ্ধি বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করল। ধীরে ধীরে মুদিখানার দোকান বসিয়েছে, সঙ্গে চালের দোকান। ক্রমশঃ তা ফুলে ফেঁপে পরিণত হয়েছে একটি রমরমে ব্যবসা-কেন্দ্রে। সেই নিবারণের একমাত্র ছেলে পলাশ। স্কুলের মধ্যবর্তী পর্যায়ে এসে একই ক্লাসে বার তিনেক পলাশের ফেল করার সুবাদে নিবারণের সহজ বুদ্ধিতে এটা বুঝতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব ঘটেনি, ছেলের বিদ্যাশিক্ষার জন্য অর্থব্যয় নিছক একটি অলাভজনক লগ্নি। কিন্তু তবু চেষ্টার ত্রুটি করেনি নিবারণ। কিন্তু পরিশেষে হাল ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। তাই পলাশ এখন নির্ভেজাল একটি নিষ্কর্মা এবং বাপের পয়সায় কাপ্তানি ক'রে বেড়ানোতে তার সময় এবং সুযোগ কোনোটারই অভাব নেই। মেয়েদের পেছনে লাগা তার অন্যতম প্রিয় ব্যসন। কয়েকটি শাগরেদও জুটিয়েছে।

এহেন পলাশের কাছে সদ্য-যৌবনা স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী বিনতা যে একটি লোভনীয় টার্গেট হয়ে